স্থানীয় মৌলবাদ, না বৈশ্বিক ফ্যাসিবাদ?

বাংলাদেশ : রাষ্ট্র, ধর্মীয় রাজনীতি ও সন্ত্রাসের ভূমি

আনু মুহাম্মদ

সারাবিশ্বে সংবাদমাধ্যমে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামপন্থী সন্ত্রাস নিয়ে প্রবল মনোযোগ এবং হুলস্থুল দেখা গেলেও এর উৎস সন্ধানে নির্লিপ্ততাও দেখা যায় সেরকমই। যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ মডেল' জোরকদমে এগিয়ে যাবার সাথে সাথে বাড়ছে সন্ত্রাসী ভুতুড়ে গোষ্ঠী, ডিজিটাল প্রচারণা আর অদৃশ্য সরকারের তৎপরতা। দেশে দেশে পুঁজিপন্থী সংস্কার চলছে আর তার যাত্রাপথ মসৃণ করে বিভিন্ন ধর্মের নামে উন্মাদনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'মৌলবাদ', 'আধুনিকতা', 'পশ্চিম', 'ধর্ম', 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ইত্যাদি নিয়ে সাদাকালো বিভাজনকে প্রশ্নের মধ্যে আনার তাগিদ তৈরি হয়েছে। তাই বৈশ্বিক ফ্যাসিবাদী পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে বর্তমান প্রবন্ধে এসব বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে। একইসাথে বাংলাদেশের রাষ্ট্র, ধর্মপন্থী ও তথাকথিত সেকুলার রাজনীতির পারস্পরিক ঐক্য-বিবাদের নানা গ্রন্থি তুলে ধরে বাংলাদেশের বিপদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

পরিস্থিতি

বিশ্বের অন্য অনেক অঞ্চলের মতো দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও রাজনীতিতে ধর্ম এখন আগের যে কোনো সময়ের চাইতে বেশি উপস্থিত। ধর্ম সামনে রেখে সহিংসতা, অসহিষ্ণুতা, সন্ত্রাসও বাড়ছে ক্রমেই। পাকিস্তান প্রথম থেকেই ইসলামি রাষ্ট্র। তবু সেখানে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে সহিংস সংঘাত কখনো কমেনি, বরং বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পাকিস্তান এখন সন্ত্রাসের ও ড্রোন হামলার স্থায়ী ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এ অঞ্চলের সবচাইতে বড় রাষ্ট্র ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে 'ধর্মনিরপেক্ষ' হলেও সেখানে গত দুই দশকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রসার ঘটেছে অনেক। সর্বশেষ নির্বাচনে একচেটিয়া বিজয় নিয়ে সেখানে হিন্দুত্ববাদী দল ক্ষমতাসীন। প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি। জোর করে ইতিহাস পরিবর্তন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ ও বিদ্বেষও নানাভাবে বাড়ছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। নেপালে নতুন প্রণীত সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতা বিধান রেখে পাস হলেও নেপালকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণার জন্য সেখানে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছে। নেপালের রাজনীতিতে ভারতের বর্তমান সরকার সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে। সামনে সেখানেও হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি প্রসারের আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ফেরত এসেছে, তবে সাথে আছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামও। 'ধর্মনিরপেক্ষ' দল/জোট ক্ষমতায় থাকলেও রাজনীতি ও সমাজে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাহীনতা দিন দিন বাড়ছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন 'ধর্মনিরপেক্ষ' দলকেও পরিচালনা করছে। বিশ্বজুড়ে ধর্মকে ধরে সন্ত্রাস, সংঘাত ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে। তার থেকে বেশি বাড়ছে আতঙ্ক এবং এ বিষয় নিয়ে ধোঁয়াশা।

বিশ্বজুড়ে ধর্মকে ধরে সন্ত্রাস, সংঘাত ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে। তার থেকে বেশি বাড়ছে আতঙ্ক এবং এ বিষয় নিয়ে ধোঁয়াশা।

বিষয়ের জটিলতা

বর্তমান সময়ে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনার গুরুত্ব বহুবিধ। কারণ প্রথমত, বিশ্বজুড়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'ধর্মীয়' এজেন্ডার চাপ আগের চাইতে অনেক বেশি। একই সময়ে সাম্প্রদায়িক, জাতিবিদ্বেষী, বর্ণবাদী, যৌনবাদী, অসহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়গুলোও আগের তুলনায় বেশি উপস্থিত। দ্বিতীয়ত, ধর্মকে ভিত্তি করে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য নানা গোষ্ঠীর তৎপরতা বাড়ছে। 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের' নামে দেশে দেশে সামরিকীকরণ বাড়ছে। তৃতীয়ত, শোষণ ও অবিচারের সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং এর থেকে মুক্তির দিশাহীনতার মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের নানাবিধ সংগঠন ও তৎপরতা অনেক বেশি পরিসর তৈরি করেছে। চতুর্থত, 'ধর্মনিরপেক্ষ' হিসেবে পরিচিত অনেক রাজনৈতিক দলও নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে, ক্ষমতা ও ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে ধর্ম ও ধর্মীয় বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। এবং পঞ্চমত, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা তার প্রাসঙ্গিকতা টিকিয়ে রাখতে নানাভাবে 'ধর্মীয় সন্ত্রাস' চাষ করছে।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি নিজের কয়েকটি প্রশ্নের মুখোমুখি হই। এগুলো হলো : এক. 'মৌলবাদী' শব্দটি ধর্মপন্থী রাজনীতি বোঝাতে উপযুক্ত শব্দ কি না? দুই. এই রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে সব সময় 'উদারনৈতিক' 'গণতান্ত্রিক' রাজনৈতিক শক্তিগুলোর বিপরীত হিসেবে দেখা ঠিক কি না? তিন. তথাকথিত 'মৌলবাদী' রাজনৈতিক শক্তি কি পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধ কোনো শক্তি, 'মৌলবাদ' আর পুঁজিবাদী উন্নয়নের মধ্যে কি অন্তর্গত কোনো বিরোধ আছে? চার. প্রান্তস্থ দেশগুলোতে 'মৌলবাদ' কি বৈশ্বিক পুঁজিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ তৈরি করেছে? পাঁচ. 'মৌলবাদ' কি কেবল মুসলিম দেশ ও গ্রামীণ অঞ্চলের বিষয়? এবং ছয়. ধর্মপন্থী রাজনীতি কি সমাজের গরিব নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে বা করতে পারে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা ক্রমশ পেতে থাকব আশা করি। তবে রাষ্ট্র, রাজনীতি ও মৌলবাদ নিয়ে লেখার শুরুতে কয়েকটি বিষয়ে আমার অবস্থান পরিষ্কার করে নিতে চাই।

প্রথমত, সাধারণভাবে ধার্মিক মানুষের কাছে ধর্মের রূপ, আর ধর্মের একটি নির্দিষ্ট বয়ানের ওপর ভিত্তি করে কোনো গোষ্ঠীর রাজনৈতিক তৎপরতা এক কথা নয়।

দ্বিতীয়ত, নিজ নিজ ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মের মৌল আদর্শের প্রতি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার/তাদের বিশ্বাস ও চর্চার অধিকার অবশ্যই রাখে। তা অন্য কারো সঙ্গে না মিললে তাতে কেউ আপত্তি করতে পারে না, যদি তা তাদের অসুবিধা না ঘটায়।

কিন্তু তৃতীয়ত, কোনো ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংগঠন যখন ধর্মের মৌল আদর্শ নিজেদের মতো সংজ্ঞায়িত করে, এবং অন্যদের মত/বিশ্বাস/চর্চা

অস্বীকার করে তা বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করে তখন তা তৈরি করে সহিংস পরিস্থিতি। জোর করে চাপানোর এই মতাদর্শিক অবস্থানই ফ্যাসিবাদী রাজনীতির জন্ম দেয়।

চতুর্থত, ধর্মীয় চর্চায় যুক্ত আছেন, সেটাই তাঁদের জীবিকা– এরকম ইমাম, মুয়াজ্জিন, মাদ্রাসা শিক্ষক প্রমুখকে কায়েমি স্বার্থবাদীদের সাথে গাঁটছড়ায় বাঁধা কতিপয় ক্ষমতাবান ধর্মীয় নেতার ভূমিকা থেকে ভিন্নভাবে দেখতে হবে। কারণ এই পেশাজীবীরা পেশাগত কারণে এবং জীবিকার প্রয়োজনে সাধারণত বিত্তবান ও ক্ষমতাবানদের ওপরই নির্ভরশীল থাকেন।

পঞ্চমত, মৌলবাদী আর সাম্প্রদায়িক এক কথা নয়। কারো মধ্যে এই দুটো প্রবণতা একসাথে না-ও থাকতে পারে। মৌলবাদ ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জীবনচর্চা কাঠামো। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ধর্মের পরিচয়কে ভিত্তি করেই তৈরি হয়, কিন্তু সাম্প্রদাযিক ব্যক্তি মানে অন্য সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বিদ্বিষ্ট, আক্রমণমুখী। একজন ধর্মবিশ্বাসী সাম্প্রদায়িক না-ও হতে পারেন, যেমন একজন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ধর্মবিশ্বাসী বা চর্চাকারী না-ও হতে পারেন। অর্থাৎ ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়কে নিয়ে বিদ্বেষী রাজনীতি এক কথা নয়। অভিজ্ঞতা বলে, সাম্প্রদায়িকতা অনেক সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘুর জমিজমা-সম্পদ দখলের আবরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ষষ্ঠত, ধর্মবিশ্বাসী মানেই মৌলবাদী নন। ধর্মবিশ্বাসী মানেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অনুসারী নন।

সপ্তমত, খ্রিস্টান মানে খ্রিস্টান সুপ্রিমেসিস্ট নয়, ইহুদি মানেই ইহুদিবাদী নয়, হিন্দু মানেই বর্ণবাদী নয়, ইসলামপন্থী রাজনীতি মানেই সন্ত্রাসী নয়।

এবং অষ্টমত, মৌলবাদ প্রাচ্য নির্দিষ্ট বা প্রাচীন মতবাদ যেমন শুধু নয়, বস্তুত এর শুরু পাশ্চাত্যেই, এবং এটি বর্তমানে 'আধুনিক' ব্যবস্থারই ফলাফল। ইহজাগতিকতা বা সেক্যুলারিজম এবং গণতন্ত্রও পশ্চিম নির্দিষ্ট এবং 'আধুনিক' কালের বিষয় শুধু নয়। এর বহু ধারা বিভিন্নকালে মুসলিম বিশ্বসহ প্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া যায়।

মৌলবাদ প্রাচ্য নির্দিষ্ট বা প্রাচীন মতবাদ যেমন শুধু নয়, বস্তুত এর শুরু পাশ্চাত্যেই, এবং এটি বর্তমানে 'আধুনিক' ব্যবস্থারই ফলাফল। ইহজাগতিকতা বা সেক্যুলারিজম এবং গণতন্ত্রও পশ্চিম নির্দিষ্ট এবং 'আধুনিক' কালের বিষয় শুধু নয়। এর বহু ধারা বিভিন্নকালে মুসলিম বিশ্বসহ প্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া যায়।

মৌলবাদী এজেন্ডা

মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ বা ইহুদি–যে ধর্মেরই হোক না কেন, এর অনুসারী রাজনৈতিক শক্তি স্ব স্ব ধর্মগ্রন্থ বা 'ঐশী বিধানের' নিজ নিজ ব্যাখ্যার ওপর ভর করেই তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। বৌদ্ধ ধর্ম নিরীশ্বর হলেও তার মধ্যেও বিধি-বিধান নিয়ে ব্যাখ্যা ও ভূমিকার তারতম্য হয়। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তি তাঁরা ইহজগতের রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ, আইন-কানুন, প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের নিজ নিজ ব্যাখ্যাকে বিতর্কের উর্ধ্বে বিবেচনা করেন। হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে একটি বাড়তি বিষয় হলো বর্ণপ্রথা, যা এর মৌল ভিত্তি।

মৌলবাদী বা ফান্ডামেন্টালিস্ট শব্দটি এসেছে মার্কিন প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে। তাঁরা তুলনামূলকভাবে উদারনৈতিক খ্রিস্টানদের থেকে নিজেদের পার্থক্য বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করতেন। এখন এই শব্দটি ইসলামপন্থী রাজনীতির বিষয়েই ব্যবহৃত হয় বেশি। মৌলবাদী বলতে সাধারণভাবে বোঝানো হয়, ধর্মগ্রন্থ যে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিধি-বিধান জারি করেছে তার মধ্যেই সকল সমস্যার সমাধান খোঁজা এবং এর বাইরে কোনো কিছু গ্রহণ করতে অসম্মতি। এর অর্থ হলো, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন তাদের বিবেচনাগ্রাহ্য নয়। সেই হিসাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথেও তাদের মিলবার কথা নয়। এজন্য তাদেরকে অনেক সময় 'প্রাক-পুঁজিবাদী' শক্তিও বলা হয়। কিন্তু বিশ্বজুড়ে বহু ধর্মপন্থী দলের কার্যক্রম থেকে তার প্রমাণ মেলে না। ধর্মের বাণিজ্যিকীকরণ, নেতাদের জীবন-যাপন, ব্যাংক-বীমাসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে দক্ষ বিনিয়োগ তৎপরতা, অর্থনৈতিক নীতি ইত্যাদি কোনো কিছুই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে না। বরং তাদের বৃহদাংশ পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই একটি নির্ধারিত সংস্করণ তৈরির জন্য চেষ্টারত, তারা বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বায়নেরও সুফলভোগী। বর্তমান ধর্মপন্থী রাজনীতি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর। যোগাযোগ-প্রযুক্তির বিকাশ পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের সাথে সাথে ধর্মপন্থী রাজনীতির বিস্তার ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরিতেও সহযোগী হয়েছে।

পার্থক্য এখানেই যে, ধর্মপন্থী রাজনীতির প্রধান কয়েকটি অংশ ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রত্যাশী। যেমন–বিজেপি-আরএসএস পুঁজিবাদের কট্টর বা নয়া উদারনৈতিক ধারা অনুসরণ করছে হিন্দুত্ববাদের আবরণ দিয়ে। জামায়াতে ইসলামীর অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচি অনুযায়ী ব্যক্তিগত সম্পত্তিও মুনাফাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক তৎপরতা তাদের সমাজ-অর্থনীতি মডেলের দুটো গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। বলা হয়, অর্থনীতির একচেটিয়াকরণ ও বৈষম্য ঠেকাতে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা থাকবে। এই ব্যবস্থা পরিচালিত হবে 'ঐশী নির্দেশ' বা 'আল্লাহর আইন' অনুযায়ী, যা নির্ধারণ করবেন ক্ষমতাবানরা; এর বিরুদ্ধে ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ নেই। একদিকে শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা– এই দুটোর সমন্বয় প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাই নির্দেশ করে।

তবে কোনো ধর্মই ইতিহাসের বাইরে নয়, স্থান-কাল নিরপেক্ষ নয়। সেজন্য সকল ধর্মের মধ্যেই স্থান ও কালের ছায়া আছে। সকল ধর্মের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন কাল ও স্থানভেদে নানা মত ও পথের সন্ধান পাওয়া যায়। অভিন্ন গ্রন্থ বা ধর্মীয় কাঠামো থেকে এই ভিন্ন ভিন্ন মত ও তরিকা তৈরি হয় স্থান-কাল ছাড়াও সামাজিক-অর্থনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থানগত ভেদের কারণে। অর্থাৎ ধর্মের ব্যাখ্যা ব্যক্তি/গোষ্ঠী/মতাদর্শিক অবস্থানভেদে ভিন্ন হতে পারে।

প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে তো বটেই, একই ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধারা ও উপধারার মধ্যেও সংঘাত-বিদ্বেষ তাই অনেক পুরনো (আর্মস্ট্রং, ২০০১)। ইসলাম ধর্মের মধ্যেও এর কমতি নেই। বিদ্যমান ব্যবস্থায় নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন হয়। পরবর্তীকালে এই ধর্ম ব্যাখ্যায়, অনুসরণে, এমনকি আল্লাহ ও কোরআন সংজ্ঞায়নে বহু ধরনের মত ও পথ তৈরি হয় (আলম, ২০১৫)। অনড়, নিপীড়নমূলক বহু মত পরীক্ষা করলে তার সাথে ক্ষমতাবানদের যোগ পাওয়া যায়।

কিন্তু বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের অনুসারী উগ্রপন্থী রাজনীতির প্রধান ধারাগুলোর মধ্যে কিছু অভিন্ন উপাদানও পাওয়া যায়, যা আবার অনেক ক্ষেত্রে ধর্মবহির্ভূত কিছু রাজনীতির ধারার সঙ্গেও মেলে। যেমন–শ্বেতাঙ্গ উগ্রপন্থী, উগ্র জাত্যভিমানী, যৌনবাদী ইত্যাদি। ভারতে বিজেপি, শিবসেনা, আরএসএস; যুক্তরাষ্ট্রে-ইউরোপে খ্রিস্টান মৌলবাদী, উগ্রপন্থী শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী, জাতি ও ধর্মবিদ্বেষী; জামায়াত, আল-কায়েদা,

তালেবান, আইসিস–এদের সবার মধ্যেই এসব প্রবণতা কমবেশি পাওয়া যাবে। এগুলোর মধ্যে উচ্চকিত বা প্রচ্ছন্ন বক্তব্যের সাধারণ দিকগুলো নিম্নরূপ :

১. মানুষ ঐশী ক্ষমতার সৃষ্টি। ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই ঐশী গ্রন্থ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা বিশ্লেষণের ক্ষমতা বা অধিকার সকল মানুষের নেই। এই দায়িত্ব নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ধারণ করেন। এঁরা পূর্বনির্ধারিত ধর্মীয় নেতা।

২. এই বিশ্বাস-কাঠামো এবং তাঁদের ইহজাগতিক জীবন অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট উচ্চক্রম অনুযায়ী কঠোর আইন দ্বারা সংগঠিত ব্যবস্থায় পরিচালিত হতে হবে।

৩. 'ঈশ্বরের বিধান' হিসেবে ধর্মীয় নেতাদের স্বীকৃত বিষয়গুলো নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। 'মানুষের তৈরি' কোনো বিধান দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপন করা যাবে না।

৪. একই ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধারা-উপধারা গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য ধর্ম বা বিশ্বাসের মানুষ বিশেষ বিবেচনায় থাকবে, সমান মর্যাদা নিয়ে নয়।

৫. নারীকে পূর্ণ মানুষ হিসেবে স্বীকারে অনীহা, ভূমিকা নির্দিষ্ট পরিসরে সীমিতকরণ। ঘরে ও বাইরে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নকে বৈধতাদানের যুক্তি; বয়ানে নারীকেই সকল ঝামেলার কারণ, পাপের আধার, বিপজ্জনক, অনিয়ন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত করা।

৬. গর্ভপাত, নির্ধারিত বিধি-বিধানের বাইরে নারী-পুরুষ সম্পর্ক পাপ হিসেবে বিবেচিত।

৭. নির্দিষ্ট কাঠামোর বাইরে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা গ্রহণযোগ্য নয়। ধর্মের কাঠামোর মধ্যে থেকেও স্বাধীন চিন্তা বা (কর্তৃত্বের সাথে) ভিন্নমত হুমকির সম্মুখীন। লেখক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, ধর্মতাত্ত্বিক–অনেকেই বিভিন্ন সময়ে নির্যাতিত।

বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন, সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার তৎপরতা আগের তুলনায় বেড়েছে। তবে ইসলামপন্থী রাজনীতির কোনো একক বা সমরূপ চেহারা নেই। কারো কাছে এর লক্ষ্য ওপর থেকে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সমাজকে পরিবর্তন করা, কারো কাছে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে রাজনীতিকে প্রভাবিত করা। আবার ইসলামের ভিত্তি যে কুরআন, তার ব্যাখ্যায় হাজারো মত। ইসলামের মুক্তিকামী ব্যাখ্যার পাশাপাশি নারীবাদী ব্যাখ্যা ইসলাম সম্পর্কে অনেক নতুন চিন্তাও যোগ করেছে (আহমেদ, ২০০৬; মুহাম্মদ ২০১২)। সমাজে ইসলাম কায়েম করা সবার কাছে রাজনীতিও নয়। উল্লেখযোগ্য কিছু ধারা আছে, যারা ব্যক্তিকে ইসলামের পথে আনার মাধ্যমে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নীতি অনুসরণ করে। সুফিবাদী ধারা ধর্ম-মত নির্বিশেষে মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে অনেকের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান নিয়ে হাজির হয়।

ইসলামি রাষ্ট্র অতীতে আমরা অনেক দেখেছি, বর্তমান বিশ্বেও তা দুর্লভ নয়। অতীতে বিভিন্ন স্থানে ও কালে ইসলামি রাষ্ট্রের রূপ ভিন্ন ভিন্ন দেখা গেছে। ইসলামের শুরুতে খেলাফত স্বল্পস্থায়ী ছিল, তবে রাজতন্ত্র অনুমোদিত ছিল না; কিন্তু ইমাম হোসেনের ঘাতক ইয়াজিদকে দিয়েই রাজতন্ত্র শুরু, যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে। মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, জর্দান, সংযুক্ত আরব আমিরাত কথিত ইসলামি শাসনব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত। রাজতন্ত্র অনুমোদিত ইসলামি আইন, বিধান ও প্রতিষ্ঠান সেখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর। অন্যদিকে পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র। বাংলাদেশ, আফগানিস্তানসহ কয়েকটি রাষ্ট্রে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম। ইরান ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পরিচালিত। এই ব্যবস্থায় ধর্মীয় নেতা ও নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্টের একটি সমন্বয় তৈরি করা হয়েছে।

মৌলবাদ, ধর্মীয় সন্ত্রাস ও সাম্রাজ্যবাদ

পুঁজিবাদ সম্প্রসারণে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা খুবই সহায়ক হয়েছিল। আর উপনিবেশগুলোতে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্প্রসারণে মিশনারিদের বিভিন্ন মাত্রার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, ভূমিকা ছিল স্থানীয় ধর্মীয় নেতা ও ক্ষমতাবানদেরও। আবার ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী ভূমিকায়ও মিশনারি ও স্থানীয় কোনো কোনো ধর্মীয় নেতার ভূমিকাও দেখা গেছে। উত্তর-উপনিবেশকালে পুঁজিবাদী কেন্দ্র বা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো প্রান্তস্থ দেশগুলোতে খুঁটি ধরে রাখতে, সমাজতন্ত্র ঠেকাতে, ধর্মীয় শক্তি ব্যবহার করেছে ব্যাপকভাবে। মূলধারার চার্চ সাম্রাজ্যবাদের খুঁটি হিসেবেই বরাবর ভূমিকা পালন করেছে। একদিকে মুসলিম রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখা, অন্যদিকে ইহুদিবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের দীর্ঘমেয়াদি অবস্থান পাকাপোক্ত করেছে। মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে ইসলামপন্থী দল ও ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবিরোধী আতঙ্ক সৃষ্টি করার কাজ সহজ ছিল। বস্তুত এই ধর্মপন্থীরা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় সামরিক-বেসামরিক স্বৈরশাসকদের সমর্থন দেওয়ার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের পথও সুগম করেছে।

> তাদের বৃহদাংশ পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই একটি নির্ধারিত সংস্করণ তৈরির জন্য চেষ্টারত, তারা বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বায়নেরও সুফলভোগী। বর্তমান ধর্মপন্থী রাজনীতি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর।

আশির দশক থেকে ইসলামি 'মৌলবাদী' তৎপরতা বেড়ে যাওয়ার সাথে প্রান্তস্থ দেশগুলোতে বিপন্ন দশা ও নতুন শত্রু নির্মাণের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কিত। যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আশির দশক পর্যন্ত ধর্মপন্থী শক্তিগুলোকে সমাজতন্ত্র ও সব রকম মুক্তির লড়াইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। এই পর্যায়ের সর্বশেষ বড় উদাহরণ আফগানিস্তান। প্রথমে মুজাহিদীনদের মাধ্যমে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সমর্থিত সরকার উচ্ছেদ করে যুক্তরাষ্ট্র। সেই সময় আফগান মুজাহিদীনদের সব রকম পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে তারা। প্রশিক্ষণ দিয়েছে, অস্ত্র দিয়েছে, অর্থ দিয়েছে। অর্থ দিয়েছে সৌদি আরবও। ইউএসএইড সরবরাহ করেছে ইসলামি উম্মাদনা সৃষ্টির মতো বই, শিশুদের পাঠ্যপুস্তক। যার মধ্যে সোভিয়েত সৈন্যের চোখ উপড়ে ফেললে বেহেশতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও ছিল। সিআইএর এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠের ভূমিকা পালন করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। সামরিক শাসনের মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউল হকের মতো একজনকে অধিষ্ঠিত করা সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের খুব কাজে দিয়েছে। একপর্যায়ে আকস্মিকভাবে বিশাল শক্তি নিয়ে উদিত হয় তালেবান। মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যাদের অস্ত্র, সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ, কৌশলগত সমর্থন–সবই জোগান দিয়েছে সেই যুক্তরাষ্ট্রই।

তালেবানরা আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখলের সূচনা করে ১৯৯৭ সালের ২৪ মে। ঠিক তার আগের দিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ ব্যবসাজগতের মুখপত্র ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল আফগানিস্তান নিয়ে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। সেখানে লেখা হয় : "আফগানিস্তান হচ্ছে মধ্য এশিয়ার তেল, গ্যাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির প্রধান পথ।...তাদের পছন্দ করো বা না করো, ইতিহাসের এই পর্যায়ে তালেবানরাই আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সবচাইতে উপযুক্ত" (জার্নাল, ১৯৯৭)। দুদিন পর

অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের ২৬ মে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমস লেখে : "ক্লিনটন প্রশাসন মনে করে যে তালেবানদের বিজয় ইরানের পাল্টা শক্তি হিসেবে দাঁড়াবে...এমন একটি বাণিজ্যপথ উন্মুক্ত করবে, যা এই অঞ্চলে রাশিয়া ও ইরানের প্রভাবকে দুর্বল করবে" (টাইমস, ১৯৯৭)। মার্কিন তেল কোম্পানি ইউনোকল ক্লিনটন প্রশাসন ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের অবস্থানকে 'খুবই ইতিবাচক অগ্রগতি' বলে অভিহিত করে। এই কোম্পানি বিশ্ববাজারে বিক্রির জন্য তুর্কমেনিস্তান থেকে আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল নেওয়ার প্রকল্প নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

একই বছর যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক দিক থেকে আরো অনেক শক্তিশালী ও আক্রমণাত্মক করার প্রকল্প নেওয়া হয়, যার শিরোনাম ছিল 'প্রজেক্ট ফর দ্য নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরি'। এতে যাঁরা স্বাক্ষর করেন তাঁদের মধ্যে ইউনোকল কর্মকর্তা, অস্ত্র ব্যবসায়ীসহ আরো ছিলেন ডিক চেনি, ডোনাল্ড রামসফেল্ড, জেব বুশ ও ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা (আলী, ২০০৩)। বিশ্বব্যাপী নয়া উদারতাবাদী ধারার সংস্কার, দখল, আধিপত্যের নতুন পর্ব আরো জোরদার হয়। ২০০১ সালে নিউ ইয়র্কের 'টুইন টাওয়ার' হামলার পর থেকে এই কর্মসূচির অধিকতর সামরিকীকরণ ঘটে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী প্রচারণাও জোরদার হয়। সৌদিসহ মুসলিম রাজতন্ত্রকে ভর করেই এই সন্ত্রাসী আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এই প্রচারণার প্রতিক্রিয়ায় ইসলামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রও উর্বর হতে থাকে। অপমান, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষোভে ইসলামপন্থী রাজনীতির নতুনভাবে প্রসার ঘটে।

কার্যত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তাদের নতুন শত্রুপক্ষ নির্মিত হয় ১৯৯১ সালে প্রথম ইরাক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। তার পর থেকে ক্রমান্বয়ে 'ইসলামি সন্ত্রাসী' বাড়তে থাকে এবং তার বিরোধী লড়াই একটি বৈশ্বিক এজেন্ডার রূপ দেয়। সোভিয়েত প্রভাবের বিরুদ্ধে আশির দশকে ইসলামপন্থী জঙ্গি সশস্ত্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে ঐক্য তৈরি হয়, যেভাবে তার আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়, তার ধারাবাহিকতা পরেও অব্যাহত থাকে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বর্তমান সময়ে ক্রমবর্ধমান নৃশংসতার মধ্যেও পাওয়া যাবে। আইসিস, তালেবান, আল-কায়েদা ইত্যাদি নামে পরিচিত যেসব গোষ্ঠীকে দমন করার কথা বলে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে দখলদারিত্বের নতুন জাল ফেঁদেছে, তারা সবাই মার্কিনদেরই সৃষ্ট বা লালিত-পালিত দানব। এগুলোর সূত্রে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন ভয়ংকর ঘটনা ঘটছে। ইসলামের নাম নিয়ে এইসব গোষ্ঠীর বর্বর দিগ্‌ভ্রান্ত সন্ত্রাসী তৎপরতাকে কেউ কেউ 'জিহাদ', কেউ কেউ 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই' বলে মহিমান্বিত করতে চান। মোহমুক্ত থাকলে এসব বয়ান যে কত ভ্রান্ত তা উপলব্ধি করা কঠিন নয়।

অনেকে আবার এরকমভাবে বলেন যে যুক্তরাষ্ট্র 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' পরিচালনা করছে 'ইসলামি জঙ্গি'দের বিরুদ্ধে, সেক্যুলার শক্তির পক্ষে। এটিও আরেকটি বড় ভ্রান্তি। বস্তুত নির্বাচিত সেক্যুলার সরকার উচ্ছেদে মার্কিন রেকর্ড অনেক। সত্তর ও আশির দশকে আফগানিস্তানে সেক্যুলার সরকারই ক্ষমতায় ছিল, কিন্তু তারা ছিল মার্কিনবিরোধী সোভিয়েতপন্থী। এই সরকারগুলো আফগানিস্তানে ভূমি সংস্কার, নারী অধিকার, শিক্ষা ও চিকিৎসা সংস্কারে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল। ইরাক ও লিবিয়ায়ও সেক্যুলার সরকার ছিল। শিক্ষা, চিকিৎসা, বিশুদ্ধ পানিসহ জন-অধিকারের ক্ষেত্রেও তাদের অনেক সাফল্য ছিল। যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দাম ও গাদ্দাফিকে উচ্ছেদের পর সেসব ব্যবস্থা তছনছ হয়ে গেছে। আর সেখানে বিভিন্ন ইসলামপন্থী গোষ্ঠীর প্রভাব বেড়েছে।

> কোনো ধর্মই ইতিহাসের বাইরে নয়, স্থান-কাল নিরপেক্ষ নয়। সেজন্য সকল ধর্মের মধ্যেই স্থান ও কালের ছায়া আছে। সকল ধর্মের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন কাল ও স্থানভেদে নানা মত ও পথের সন্ধান পাওয়া যায়। অভিন্ন গ্রন্থ বা ধর্মীয় কাঠামো থেকে এই ভিন্ন ভিন্ন মত ও তরিকা তৈরি হয় স্থান-কাল ছাড়াও সামাজিক-অর্থনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থানগত ভেদের কারণে।

একই সঙ্গে গণনায় লাশের সংখ্যাও বাড়ছে। গত ২৯ মার্চ 'বডি কাউন্ট : ক্যাজুয়ালটি ফিগারস আফটার টেন ইয়ারস অব দ্য ওয়ার অন টেরর' নামের এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে জার্মান, কানাডিয়ান ও মার্কিন তিনটি সংগঠন যৌথভাবে। এগুলো হলো ইন্টারন্যাশনাল ফিজিশিয়ানস ফর দ্য প্রিভেনশন অব নিউক্লিয়ার ওয়ার, ফিজিশিয়ানস ফর সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি এবং ফিজিশিয়ানস ফর গ্লোবাল সারভাইভাল। এই রিপোর্টে ২০০৪ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত পরিচালিত সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণে ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে ১৩ লাখেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ১০ লাখ ইরাকে, দুই লাখের বেশি আফগানিস্তানে। মার্কিন ড্রোন ও অন্যান্য আক্রমণে ৮০ হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে শুধু পাকিস্তানেই। এর মধ্যে বেসামরিক নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।

২০০১-এর আগে ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়ায় আল-কায়েদা বা তালেবান ধারার কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। তথাকথিত 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' এই অঞ্চলকে চেনা-অচেনা সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে। সর্বশেষ এই অঞ্চলে বিরাট শক্তি ও সম্পদ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে আইসিস, যা ইসলামি রাষ্ট্র বা খিলাফত প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। নতুন শত শত গাড়ি, বার্ষিক ১৬ হাজার কোটি টাকার বাজেট এবং প্রায় ৩০ হাজার সশস্ত্র সদস্য নিয়ে আচমকা তারা হাজির। তারা ইরাক-সিরিয়ায় একের পর এক অঞ্চল দখল করছে। একের পর এক ভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বী, সংখ্যালঘু জাতির মানুষদের ধরছে, গলা কাটা ও নির্যাতনের দৃশ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচার করছে। হঠাৎ করে এরকম একটি বিশাল বাহিনীর জন্ম এবং ক্রমান্বয়ে বিজয় আফগানিস্তানে তালেবানদের আচমকা আবির্ভাব এবং দ্রুত আফগানিস্তান দখলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া ছিন্নভিন্ন হবার ফলে এই দেশগুলোর মানুষদের নারকীয় অনিশ্চিত অবস্থায় পড়তে হয়েছে। ইউরোপে অভিবাসনের বিশাল স্রোত এরই ফলাফল। অন্যদিকে এর প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী তিন পক্ষ সৌদি আরব, ইসরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। তাদের কাছে ইরাকের সাদ্দামের অপরাধ স্বৈরশাসন ছিল না; ছিল তেলক্ষেত্র জাতীয়করণ এবং সামরিক শক্তি হিসেবে সৌদি আরব ও ইসরায়েলের কর্তৃত্ব অস্বীকারের ক্ষমতা। লিবিয়ার গাদ্দাফিরও একই অপরাধ ছিল। সৌদি রাজতন্ত্র বরাবরই তাঁর ওপর গোস্বা ছিল। জীবনের শেষ পর্যায়ে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক গড়ার লক্ষ্যে 'নয়া উদারতাবাদী' বলে পরিচিত পুঁজিপন্থী কিছু সংস্কারের পথে গেলেও গাদ্দাফির বড় অপরাধ ছিল সৌদি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্পষ্ট আক্রমণাত্মক কথাবার্তা। ২০১১ সালে গাদ্দাফি সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য ন্যাটো বাহিনীর ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি এবং আল-কায়েদাসহ বিভিন্ন ভাড়াটিয়া ইসলামপন্থীদের জড়ো করার কাজটি যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা কয়েকটি দেশ ও সৌদি আরবের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।

সিরিয়ার আসাদ সরকারেরও অপরাধ স্বৈরশাসন নয়; অপরাধ সৌদি আরব-ইসরায়েল অক্ষের কাছে তাঁর অগ্রহণযোগ্যতা। সিরিয়ার আসাদ সরকার উচ্ছেদের জন্য অতএব বিভিন্ন ক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় পশ্চিমা শক্তি ও সৌদি-কাতার-জর্দান রাজতন্ত্র। ইরানকে কাবু করাও এর একটি উদ্দেশ্য ছিল। আসাদবিরোধী এসব গোষ্ঠীর অধিকাংশই আল-কায়েদা ঘরানার বিভিন্ন গ্রুপ এবং ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী। সৌদি আরব, কাতার, তুরস্ক, জর্দান, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে বিপুল অর্থ, যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র জোগানের ওপর ভর করেই এসব গোষ্ঠী শক্তিপ্রাপ্ত হয়। এর সাথে মার্কিন, ব্রিটিশ, ফরাসি ও ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার সমন্বিত ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এদেরই অনেকে এখন গঠন করেছে আইসিস। যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট বাইডেন কিছুদিন আগে এক বক্তৃতায় মুখ ফসকে আইসিসের পেছনে এই দেশগুলোর শত হাজার কোটি ডলারসহ নানা পৃষ্ঠপোষকতার কথা বলে ফেললেও পরে মিত্রদের ক্ষোভের মুখে মাফ চেয়েছেন। বাইডেন অবশ্য নিজেদের ভূমিকার কথা বলেননি। কিন্তু সত্য ঢাকা পড়েনি।

'মৌলবাদ'কে একটি গ্রামীণ, অনাধুনিক, পশ্চাৎপদ বিষয় হিসেবে দেখলে এর শিকড় সন্ধান পাওয়া যাবে না, এর ব্যাপ্তি বোঝানো যাবে না। মার্কিন ইসলামবিষয়ক পণ্ডিত আমিনা ওয়াদুদের মতে, "ইসলামপন্থীদের বর্তমান পুনরুত্থান একটি উত্তর-আধুনিক ঘটনা" (আহমেদ, ২০০৬, ৩২)। যেভাবেই বলি না কেন, 'মৌলবাদী' শক্তিগুলোর ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভাবকে নিছক স্থানীয় বা জাতীয় বিষয় হিসেবে দেখা চলে না। তথ্য-যুক্তি দিয়েই তারিক আলী দেখিয়েছেন যে "বর্তমান সময়ে সবচাইতে বড় 'মৌলবাদ', 'সকল মৌলবাদের জন্মদাতা' হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ" (আলী, ২০০২)।

তাই এটা বিস্ময়কর নয় যে একই সাথে 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ'র নামে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ হচ্ছে, অস্ত্র জোগান বাড়ছে, নিরাপত্তাব্যবস্থা কঠোর হচ্ছে, নতুন নতুন দৃশ্যমান অদৃশ্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে, গোয়েন্দা সংস্থার দাপট বাড়ছে, সন্ত্রাস বাড়ছে, তা দমনে নতুন নতুন দমন-পীড়নের আইন, বিধি-নিষেধ তৈরি হচ্ছে। যারা সবচাইতে বড় সন্ত্রাসী, তারাই বিশ্বজুড়ে দাপাচ্ছে 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' নাম দিয়ে। তাদের সাথে যোগ দিচ্ছে বিশ্বসংস্থা, 'গণতান্ত্রিক' সভ্য রাষ্ট্র, এনজিও, 'সুবোধ' বুদ্ধিজীবী বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশ এরই অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চল, যাকে বিশ্বসন্ত্রাসের উর্বর ভূমি বানানোর চেষ্টাও খুব জোরদার বলে মনে হয়।

বাংলাদেশের সমাজ অর্থনীতি : সমৃদ্ধি ও বঞ্চনা

সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতালাভের পর গত প্রায় ৪৪ বছরে বাংলাদেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রথাগত বিচারে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অনেকগুলো দিকই চিহ্নিত করা যায়। যেমন—অবকাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে, পরিবহন ও যোগাযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে, বহুতল ভবন বেড়েছে, রপ্তানি আয়ে গার্মেন্টস গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য তৈরি করেছে, প্রবাসী আয় বৈদেশিক মুদ্রার বিশাল মজুদ তৈরি করেছে, দেশজুড়ে শপিং মল তৈরি হচ্ছে, প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক তৎপরতায় ক্ষুদ্রঋণ ও এনজিও মডেল অনেক বিস্তৃত হয়েছে, নগরায়ণ বেড়েছে, শহর-গ্রামে যোগাযোগ-প্রযুক্তির সম্প্রসারণে পেশাগত ও অর্থনৈতিক নতুন নতুন সুযোগ বেড়েছে, জনসংখ্যা যত বেড়েছে, খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে তার চাইতেও অনেক বেশি, মানুষের সচলতা বেড়েছে।

তবে এই সমৃদ্ধির গতি ও ধরনের কারণে প্রত্যক্ষ সুফলভোগী হয়েছে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী। এর সামাজিক ও পরিবেশগত খেসারতও অনেক বেশি। নদীনালা, খালবিল, বন দখল ও বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে। বৈষম্য বেড়েছে। এই সময়কালেই দেশে একটি অতি-ধনিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে। 'কালো টাকা' নামে পরিচিত চোরাই টাকার মালিকদের বিত্ত ও দাপট বেড়েছে বহুগুণ। ঢাকা শহরে এখন একই সঙ্গে বিত্তের জৌলুস এবং দারিদ্র্যের নারকীয়তা দুটোই পাশাপাশি অবস্থান করে। চোরাই কোটিপতির সংখ্যা যখন বেড়েছে, তখন মাথা গণনায় দারিদ্র্যের প্রচলিত সংজ্ঞা বা কোনোভাবে টিকে থাকার আয়সীমার নিচে মানুষের সংখ্যা চার কোটির বেশি। যদি দারিদ্র্যসীমায় শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, মানবিক মর্যাদার প্রশ্ন যুক্ত করা হয় তাহলে দেখা যাবে, শতকরা ৮০ ভাগ মানুষই অমানবিক জীবনে আটকে আছে।

নির্বিচার বেসরকারীকরণের জোর ধারায় সর্বজন বা পাবলিক সকল প্রতিষ্ঠানই ক্ষতবিক্ষত। এনজিও, কনসালটেন্সি ফার্ম, বেসরকারি ক্লিনিক, ল্যাবরেটরি ও হাসপাতাল, বেসরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিরও বিস্তার ঘটেছে অনেক। দেশে প্রচুর সুপারমার্কেট গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে গাড়ির দোকান, কম্পিউটার-মোবাইল-টিভি-ভিসিডি ইত্যাদি কেন্দ্রিক ব্যবসারও প্রসার ঘটেছে, যেগুলো প্রধানত আমদানীকৃত পণ্যের ওপরই নির্ভরশীল। প্রচলিত উন্নয়নধারার কারণেই বাংলাদেশে আশির দশক থেকে শিল্প খাতের তুলনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিকাশ ঘটেছে বেশি। স্বনিয়োগভিত্তিক কাজের অনুপাত বেড়েছে। এছাড়া রিকশা, অটোরিকশা, বাস, ট্রাক, টেম্পোসহ বিভিন্ন পরিবহন, হোটেল-রেস্তোরাঁ, ছোটবড় দোকান ইত্যাদি বেশির ভাগ মানুষের অস্থায়ী নিয়োজনের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'টুকটাক অর্থনীতি' হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রমজীবী মানুষের প্রধান কর্মক্ষেত্র। এসব খাতে বেশির ভাগ কাজ অস্থায়ী, অনিয়মিত এবং মজুরি নিম্নমাত্রার।

> আশির দশক থেকে ইসলামি 'মৌলবাদী' তৎপরতা বেড়ে যাওয়ার সাথে প্রান্তস্থ দেশগুলোতে বিপন্ন দশা ও নতুন শত্রু নির্মাণের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কিত।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে সংখ্যক মানুষ বিভিন্ন ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত তার চাইতে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশি মানুষ শ্রমিক হিসেবে কর্মরত বিদেশে। এদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। দেশে তাদের কর্মসংস্থান নেই। বিদেশেও তাদের জীবন ও জীবিকা চরম নিরাপত্তাহীনতার শিকার। অন্যদিকে এদেরই পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা অর্থাৎ রেমিট্যান্স এখন বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। দেশে সার্ভিস সেক্টরের দ্রুত বিকাশ কর্মসংস্থানকে খুবই অস্থায়ী, নাজুক, কম আয়যুক্ত পর্যায়ে রেখেছে। শিক্ষা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এর প্রভাব আছে। দোকানদারি অর্থনীতির উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের চাহিদা বাড়ছে, যা দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্থায়ী ভিত্তি তৈরির জন্য আগ্রহী নয়। দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস বিষয়ে মৌলিক জ্ঞানচর্চা বাহুল্য জ্ঞান করা হয়। আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বাজার ও ভোগবাদিতার প্রভাব বেড়েছে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, ধর্মীয়করণ ও বেসরকারীকরণ ঘটেছে ব্যাপক মাত্রায়। সর্বজন অভিন্ন শিক্ষার তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষা এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক শিক্ষার প্রসারে সব সরকারই পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে।

কয়েক দশকে নারীর দৃশ্যমান সচলতা অনেক বেড়েছে। পাশাপাশি ঘরে-বাইরে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনাও বাড়ছে। তার বিরুদ্ধে ছোটবড় প্রতিরোধও তৈরি হচ্ছে। গার্মেন্টসে বর্তমানে শ্রমিকদের মধ্যে

শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই নারী। শহর ও গ্রামে সরাসরি মজুরি-শ্রমিক হিসেবে নারীর উপস্থিতি এখন তুলনায় অনেক বেশি দেখা যায়। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদেরও নিয়মিত বেতনের বিনিময়ে কাজে অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। গ্রাম-শহরে জমি, কাজ ও আশ্রয় থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া ছিন্নমূল মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি শিশু ও নারীকে তুলনায় আক্রান্ত করে বেশি। জালিয়াতি, প্রতারণা ও নিপীড়নের মাধ্যমে যৌন বাণিজ্যে শিশু, কিশোরী ও তরুণীদের ক্রমবর্ধমান হারে যুক্ত করার সুযোগ এখান থেকেই তৈরি হচ্ছে।

সন্ত্রাস, দখল, লুণ্ঠন এখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তৎপরতার গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বন-জঙ্গল, সরকারি জমি, সাধারণ সম্পত্তি, নদীনালা, খালবিল–সবই এখন দখলের বস্তু। এই দখল-সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও অপরাধমূলক তৎপরতা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভব নয়। এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয়। নয়া উদারতাবাদী বা পুঁজিপন্থী অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে গৃহীত নীতিমালায় সকল সাধারণ সম্পত্তির মুনাফামুখী দখলের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। এসব নীতির কারণেই গত কয়েক দশকে কতিপয় গোষ্ঠীর হাতে বিপুল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে পেরেছে। দেশের তেল-গ্যাস-কয়লাসহ জাতীয় সম্পদ, বিদ্যুৎ খাত, অবকাঠামো এখন বহুজাতিক পুঁজি দখল করছে, আরো দখল নিশ্চিত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়ার পাশাপাশি ভারত এখন বাংলাদেশের অর্থনীতির সর্বক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণে আইনি-বেআইনি বিভিন্ন তৎপরতায় লিপ্ত।

গত কয়েক দশকে একদিকে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর জৌলুস, অন্যদিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের দারিদ্র্য ও বৈষম্যের বিভীষিকা; একদিকে সম্ভাবনার বিকাশ, অন্যদিকে দেশি-বিদেশি দখলদারদের দাপটে নিরাপত্তার বিপর্যয় একটি নির্মম বৈপরীত্যের মধ্যে বাংলাদেশকে নিক্ষেপ করেছে। দেশে এযাবৎ অনেক সামরিক-নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু এসব নীতির ক্ষেত্রে, দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে শুধু মাত্রাই বেড়েছে–নতুন কোনো গতিমুখ বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়নি। দল বদলেছে; প্রক্রিয়ার বদল হয়নি। রাজনীতির মূলধারা তাই জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে না; করে দেশি ও বিদেশি দখলদারদের। এইসব গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার জন্যই তাদের প্রতিযোগিতা আর হিংস্র সংঘাত। আর এখানেই বর্ম হিসেবে ধর্ম ও ধর্মপন্থী গোষ্ঠী ব্যবহারের প্রতিযোগিতা। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে হতাশা, নিয়তিবাদিতার পাশে ধর্মপন্থী বিভিন্ন গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক তাদের অবস্থান শক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

> অনেকে আবার এরকমভাবে বলেন যে যুক্তরাষ্ট্র 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' পরিচালনা করছে 'ইসলামি জঙ্গি'দের বিরুদ্ধে, সেক্যুলার শক্তির পক্ষে। এটিও আরেকটি বড় ভ্রান্তি।

রাজনীতিতে ধর্ম : যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, জামায়াত ও হেফাজত

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় সকল ইসলামপন্থী দল এবং অধিকাংশ প্রভাবশালী পীর পাকিস্তান সামরিক জান্তার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ সরাসরি পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা ও ধর্ষণের পক্ষে সাফাইও গেয়েছেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যারা পীর বা নেতা হিসেবে এঁদেরই মেনেছে জীবনভর, তারা উল্টো মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়েছে। ধর্মীয় নেতাদের অবস্থান তাদের প্রভাবিত করতে পারেনি। স্বাধীনতার পরও বাংলাদেশের মানুষ এই ধারা অব্যাহত রেখেছে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চা থেকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তারা আলাদা করে রেখেছে।

ইতিহাস আরো সাক্ষ্য দেয় যে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানায়নি, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার জন্য কোনো মিছিল করেনি, সংবিধানকে পরিবর্তন করার জন্য দাবি তোলেনি, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার পক্ষেও কোনো মত প্রকাশ করেনি; তবু বিভিন্ন সময়ে শাসকগোষ্ঠী এসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের নিজেদের সুবিধার্থে, অন্য ব্যর্থতাকে আড়াল করতে কিংবা জনগণের ধর্মানুভূতিকে ব্যবহার করে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে। লক্ষণীয় যে বাংলাদেশে (এবং ৭১-পূর্ব ও পরবর্তী) সামরিক শাসনের কালে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রসার ঘটেছে বেশি। এর বাইরে বুর্জোয়া রাজনীতির সংকট এবং বাম রাজনীতির বুর্জোয়া লেজুড়বৃত্তি ধর্মপন্থী রাজনীতির পরিসর বাড়িয়েছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ ঘটেছে অসংখ্য। মূল যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লোকজন পার পেয়ে গেছে প্রথমেই। স্বাধীনতার পর 'দালাল আইন' করে এদেশীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কার্যক্রম শুরু হয়। একপর্যায়ে ১৯৭৩ সালে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বাদে বাকি সকলের জন্য 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করা হয়। এর ফাঁক দিয়ে অনেকেই বের হয়ে আসে। একই সময় প্রশাসনে দালালির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন শুরু হয়। অন্যদিকে এই সময়েই বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী অর্থনীতির সংস্কার শুরু হয়। সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনায় সরকারের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। ১৯৭৪-এ আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা খাতে ব্যয়বৃদ্ধি করার মাধ্যমে শেখ মুজিব 'ধর্মহীনতা'র প্রচার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে এবং একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে চেষ্টা করেন।

১৯৭৫-এর পর সামরিক শাসনামলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল বৈধ হবার সাথে সাথে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে সক্রিয় ব্যক্তিরাও সমাজে রাজনীতিতে আবারও ফিরে আসতে থাকে। ১৯৭৮ সালে জামায়াত আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। সেই সময়েই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে প্রথম আন্দোলন সূচিত হয়, তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এই আন্দোলন সারাদেশে বিস্তৃত করে। কিন্তু ১৯৮২ সালে আবারও সামরিক শাসন জামায়াতের বিপদভঞ্জন করে। পুরো আশির দশকজুড়ে এরশাদ তাঁর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ম, ধর্মপন্থী দল, মাদ্রাসা, পীর, মাজার ইত্যাদির যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। আত্মরক্ষায় দুর্বৃত্ত কিছু নেতাকে দুহাতে পৃষ্ঠপোষকতা দেন। এই সময়েই ধর্মের বাণিজ্যিকীকরণ, পীর ও ধর্মপন্থী দলগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তির সম্প্রসারণ ঘটে সবচাইতে বেশি।

আবার একই সময় এরশাদবিরোধী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী নিজেদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় যুগপৎ কর্মসূচিতে যুক্ত হতে দেবার কারণে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৫ দল ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দল পরিচালিত আন্দোলনে এভাবেই জামায়াতে ইসলামী অংশীদার হয়ে যায়। ১৯৮৬ সালে এরশাদ নির্বাচন দিয়ে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করেন। তাতে আওয়ামী লীগের সাথে সাথে জামায়াতও অংশ নেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৫ দল ভেঙে ৫ বাম দল আলাদা হয়ে যায়। সরকারের দমন-পীড়ন-হত্যা-নির্যাতনে অন্য সকল দল আক্রান্ত হলেও জামায়াতে ইসলামী তখন বেশ নিরাপদে ছিল। একদিকে প্রশাসনের প্রশ্রয়, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশীদারের বৈধতা নিয়ে এই দশকেই জামায়াতে ইসলামী দেশব্যাপী নিজেদের দলের সবচাইতে বেশি সম্প্রসারণ ঘটাতে সমর্থ হয়। এছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের দক্ষ কৌশলী নানা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়।

জামায়াতের ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতাও শুরু করে এই দশকেই। আশির দশকের দ্বিতীয় ভাগে তাই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিবিরের সন্ত্রাস, রগকাটা, হত্যার বহু খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। শিবিরের সঙ্গে প্রধানত সংঘাত হয় বাম সংগঠনগুলোর, কিন্তু কোথাও কোথাও ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সাথেও অনেকগুলো রক্তাক্ত সংঘাত দেখা যায়।

এই দশকেই বাংলাদেশেও বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি জোরদারভাবে বাস্তবায়িত হতে থাকে। সে অনুযায়ী শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রেও বাণিজ্যিক তৎপরতার সুযোগ উন্মুক্ত হয়। ক্রমে শিক্ষা, ব্যাংক, বীমা, কম্পিউটার, এনজিও সব ক্ষেত্রে জামায়াত দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। সরকারি প্রশাসন-বিনিয়োগ খাত-এনজিও-কয়েকটি দেশের দূতাবাস মিলে জামায়াতের একটি শক্ত নেটওয়ার্ক দাঁড়ায়। একদিকে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ, অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি–দুপক্ষের জন্যই অনুকূল সময় ছিল এরশাদের স্বৈরশাসন। ১৯৮৭ সালে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে নিজের পতন ঠেকাতে ১৯৮৮ সালে গণধিকৃত এরশাদ সরকারের ভোটারবিহীন নির্বাচনে গঠিত সংসদ ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' করে সংবিধান সংশোধন করে।

১৯৯০-এ এরশাদের পতন ঘটে একটি গণ-অভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দল, বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দল ও বাম ৫ দল ছাড়াও জামায়াতে ইসলামীও 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনের' অন্যতম মুখপাত্র বিজয়ী হিসেবে নিজেদের উপস্থিত করে। আশির দশকে রাজনীতিতে পুর্নবাসিত হয়ে, ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপির সরকার গঠনে সমর্থন দিয়ে সাহস সঞ্চার করে জামায়াত। ১৯৯১ সালের শেষ দিকে তারা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে নাগরিকত্ব হারানো গোলাম আযমকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমির ঘোষণা করে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুই দলই তাদের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর জন্য গোলাম আযমের কাছে দোয়া চাইতে যায়। এসবের প্রতিক্রিয়ায়ই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আন্দোলন আবারও নতুনভাবে শুরু হয়। ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি গঠিত হয় ১০১ সদস্যবিশিষ্ট 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। পরে এই কমিটি সম্প্রসারিত করে আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে অনেক বাম দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গঠিত হয় 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি'। আহ্বায়ক হন জাহানারা ইমাম। ১৯৯২-এর মার্চ মাসে যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক গণ-আদালত অনুষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলন এত বিস্তৃত হয় যে সারাদেশেই জামায়াতে ইসলামী কোণঠাসা হয়ে পড়ে।

এ পর্যায়ে একটি মহাবিপর্যয় থেকে জামায়াতকে কার্যত প্রথমে উদ্ধার করে ভারতের হিন্দুত্ববাদী বিজেপির কর্মসূচি, পরে আওয়ামী লীগের 'বৃহত্তর ঐক্য'। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে বিজেপির বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনায় যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তার আবহাওয়ায় জামায়াতে ইসলামী নিজেদের পুনর্বাসন করতে সক্ষম হয়। এর দেড় বছরের মধ্যে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে জাহানারা ইমাম মৃত্যুবরণ করেন। এই সময়েই আওয়ামী লীগ কোণঠাসা জামায়াতে ইসলামীর সাথে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসে এবং বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির যৌথ আন্দোলনের সূচনা হয়। এই ঐক্য জামায়াতকে বিরাট স্বস্তি দেয়, তার কর্মসূচির সম্প্রসারণ অনেক সহজ হয়। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যায়। একপর্যায়ে অধিকতর দর-কষাকষির ক্ষমতাসহ জামায়াত আবারও যুক্ত হয় বিএনপির সঙ্গে; গঠিত হয় ৪ দলীয় জোট। ২০০১ সালের নির্বাচনে তারা অধিকসংখ্যক আসন নিয়ে সরকারের অংশীদার হয়। স্বাধীনতার ৩০ বছর পর, গণ-আদালত আন্দোলনের ১০ বছর পর যুদ্ধাপরাধী হিসেবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে এরকম দুজন ব্যক্তি বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দুটো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জামায়াতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব আরো সম্প্রসারিত হয়।

> 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ'র নামে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ হচ্ছে, অস্ত্র জোগান বাড়ছে, নিরাপত্তাব্যবস্থা কঠোর হচ্ছে, নতুন নতুন দৃশ্যমান অদৃশ্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে, গোয়েন্দা সংস্থার দাপট বাড়ছে, সন্ত্রাস বাড়ছে, তা দমনে নতুন নতুন দমন-পীড়নের আইন, বিধি-নিষেধ তৈরি হচ্ছে। যারা সবচাইতে বড় সন্ত্রাসী, তারাই বিশ্বজুড়ে দাপাচ্ছে 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' নাম দিয়ে।

অর্থনৈতিক নীতি, দুর্নীতি, দমন, লুণ্ঠনে আশির দশক থেকে দেশ যেভাবে এগিয়েছে তাতে এসব কাজে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির কোনো ফারাক করা যায় না। তবে ১৯৭১ সালের বিচার নিষ্পত্তি না হওয়ায় আওয়ামী লীগের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে একটি ভিন্ন সমর্থনবলয় তৈরির সুযোগ তখনো অবশিষ্ট ছিল। আর ২০০৮ সালের নির্বাচনে এটাই ছিল তার শেষ অবলম্বন। সুতরাং যুদ্ধাপরাধীর বিচারের প্রতিশ্রুতি নিয়েই তাকে জনগণের সামনে যেতে হয়েছে।

ক্ষমতা গ্রহণের পর এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে গেছে আওয়ামী লীগ, ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। চিহ্নিত কয়েকজন যুদ্ধাপরাধীর বিচার শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রথম থেকেই বিভিন্ন কারণে জনগণের সংশয় কাটেনি। প্রথমত, এই আশঙ্কা বরাবরই থেকেছে যে যেহেতু আওয়ামী লীগ একবার জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্য করেছে, বার বার নানা আপোসপ্রবণতা দেখিয়েছে, তাদের একটি মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে; সেহেতু যে কোনো সময় ভোট বা অন্য কোনো বিবেচনায় আবারও এরকম কিছু করতে পারে। দ্বিতীয়ত, শুধু ১৯৭১ নয়, এর আগে থেকেই জামায়াত বরাবরই যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রশক্তি। যেসব ইসলামপন্থী রাজনীতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বরাবর ভূমিকা পালন করেছে, জামায়াত তার অন্যতম। যুক্তরাষ্ট্রের চাপ, লবিং ইত্যাদি যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে পরেও নানাভাবে সক্রিয় থেকেছে। তৃতীয়ত, গত দশকগুলোতে বাংলাদেশে যে লুটেরা শ্রেণির বিকাশ হয়েছে, ধনিক শ্রেণি গঠনের সেই প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ মুছে দখল-লুণ্ঠন-জালিয়াতির একটি শক্তিশালী চক্র তৈরি হয়েছে দেশে। এখানে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি একাকার। এই শ্রেণিমৈত্রীর শক্তি যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জমি দখল, নির্যাতনে এই ঐক্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সে কারণে প্রথম থেকেই এই বিচারকাজে সরকারের অদক্ষতা, অযত্ন, শৈথিল্য, দুর্বলতা নানাভাবে প্রকট হয়েছে। তাছাড়া ছাত্রলীগ-যুবলীগ রামদা হামলা-হত্যা-জখম-সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি করে সমাজে বিক্ষোভ বাড়িয়েছে। খুনি-সন্ত্রাসীদের ক্ষমা-প্রশ্রয় ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী নানা চুক্তি করে সরকার জনবিরোধী অবস্থান নিয়েছে। দখল, নির্যাতন, দুর্নীতি, লুণ্ঠন, জাতীয় স্বার্থবিরোধী অপকর্মের বিরুদ্ধে জনগণের নানা আন্দোলনের সামনে দাঁড়াতে না পেরে যখন-তখন যে কোনো

আন্দোলনকে 'যুদ্ধাপরাধী বিচার নস্যাতের আন্দোলন' বলে সরকারি লোকজন প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধাপরাধীদের শক্তি জুগিয়েছে। নানা রহস্যজনক ঘটনায় ভোটের হিসাব-নিকাশে সরকার জামায়াতের সাথে আবারও নতুন আঁতাতের পথে যাচ্ছে–এই সন্দেহ ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে। সমাজের ভেতরে নানা সংশয় ও প্রশ্ন নিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করার দাবিতে তৈরি হয় তরুণদের নেতৃত্বে শাহবাগ আন্দোলন। কয়েক মাস এই আন্দোলন সমাজের মনোযোগের কেন্দ্রে ছিল। তবে আওয়ামী লীগের ক্ষমতার রাজনীতির বলয়ে আটকে থাকার ফলে এই আন্দোলন বছর শেষ হবার আগেই দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে।

এই সময়েই আবির্ভাব ঘটে হেফাজতে ইসলামসহ আরো নানা গোষ্ঠীর। গঠনের তিন বছরের মাথায় ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের বিশাল সমাবেশ বিস্ময়কর ও রহস্যজনক মনে হতে পারে, কিন্তু তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এর আগের তিন দশকের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক গতিধারায়, যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগে দিয়েছি। ধর্ম নিয়ে অবমাননা, শাহবাগের প্রজন্ম চত্বর নাস্তিকদের আন্দোলন, তারা আল্লাহ ও মহানবীকে অসম্মান করেছে, কটূক্তি করেছে সম্পর্কিত প্রচার নিয়েই হেফাজত সারাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমবেত করে। এর পেছনে স্পষ্টতই বিএনপি-জামায়াতের সমর্থন ছিল। সরকার তাদের প্রথমে অনুমতি দিয়েও পরে এই সমাবেশকে বিএনপি-জামায়াত কাজে লাগাতে পারে–এই ভয়ে দীর্ঘমেয়াদি অবস্থানে বাধা দেয়। রক্তক্ষয়ী যৌথ সামরিক অভিযানে হেফাজতের সমাবেশ শেষ হয়।

তবে এর আগে থেকেই হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন মাত্রার যোগাযোগের কথা জানা যায়। সমাবেশ-উত্তরকালে এই যোগাযোগ ও সমঝোতা আগের তুলনায় বাড়ে। হেফাজতে ইসলাম এই সময়ে যে ১৩ দফা দাবি উত্থাপন করেছে, তার একাংশ অস্তিত্বহীন শত্রুর বিরুদ্ধে হুংকার এবং বেশির ভাগ নারীর জন্য অসম্মানজনক, কুৎসা রটনার শামিল ও তাকে আরো শৃঙ্খলিত করার দাবি। এছাড়া ব্লগারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণও অন্যতম দাবি ছিল। পরে আমরা যখন দেখি সরকার ব্লগারদের গ্রেপ্তার করছে, একের পর এক ব্লগার হত্যাকাণ্ডের সুরাহা করতে সরকারের অনীহা খুব দৃষ্টিকটু আকারেই প্রকাশিত, যখন দেখি সরকার নতুন আইসিটি আইনের মাধ্যমে কার্যত 'ব্লাসফেমি' আইন চর্চা করছে, তখন পর্দার পেছনের সমঝোতার ধারণাই প্রমাণিত হয়। এই পর্যায়ে আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন আওয়ামী ওলামা লীগ হেফাজতের ভাষায় বিভিন্ন দাবি-কর্মসূচি নিয়ে মাঠে সক্রিয় হয়। দেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিস্তার, সকল প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণ, নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি সমাজে গণতান্ত্রিক পরিসর যত সংকুচিত করে ততই দৃশ্যমান ও অদৃশ্য নানা ধরনের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা বাড়তে থাকে।

পুরো আশির দশকজুড়ে এরশাদ তাঁর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ম, ধর্মপন্থী দল, মাদ্রাসা, পীর, মাজার ইত্যাদির যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। আত্মরক্ষায় দুর্বৃত্ত কিছু নেতাকে দুহাতে পৃষ্ঠপোষকতা দেন। এই সময়েই ধর্মের বাণিজ্যিকীকরণ, পীর ও ধর্মপন্থী দলগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তির সম্প্রসারণ ঘটে সবচাইতে বেশি।

ধর্মের লড়াইয়ের ভাষা

বাইরের নাম কিংবা ধর্মীয় পরিচয় না দেখে উগ্র ধর্মপন্থী বা ডানপন্থী রাজনীতির বিভিন্ন ধারার মর্মবস্তু পর্যালোচনা করলে এসবের মধ্যে ভিন্ন জাতি ভিন্ন ধর্ম নারী সৃজনশীলতা সমতাবিদ্বেষী, অসহিষ্ণু, যুদ্ধপ্রেমী, নিয়ন্ত্রণমুখী উপাদান পাওয়া যায়। সাধারণভাবে শাসক শ্রেণি বা সমাজের ক্ষমতাবানদের সাথে এই গোষ্ঠীগুলোর যোগাযোগ, নির্ভরশীলতা ও সম্প্রীতি থাকে। সেজন্য ভিন্নমতাবলম্বী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষ, বিধি ভঙ্গকারী নারী, অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে এদের যত সক্রিয় সোচ্চার অবস্থান দেখা যায়, স্বৈরতন্ত্রী শাসক, জালেম, দুর্নীতিবাজ, লুটেরাদের বিরুদ্ধে তার ছিটেফোঁটাও নয়; বরং তারা এদেরই মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে অনেক সময়। তবে এটি সাধারণ চিত্র হলেও ধর্মপন্থী রাজনীতির ভিন্ন দৃষ্টান্তও বিভিন্ন স্থানে ও কালে পাওয়া যায়, যা ধর্মপন্থী রাজনীতির মূলধারাকে চ্যালেঞ্জ করে বৈষম্য-নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। অর্থাৎ ধর্মের বহু রকম ভাষা তৈরি হতে পারে।

সব কালে সব দেশে আমরা দেখি যে শ্রেণিসংগ্রাম হোক বা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই হোক, সেই লড়াইগুলোর মধ্যে সংস্কৃতি-ধর্ম বিভিন্নভাবে একটা ভাষা পেতে পারে। ল্যাটিন আমেরিকার অভিজ্ঞতা থেকে দেখি তারা তাদের সংস্কৃতি, বিশেষত মিথ ব্যবহার করে অনেক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছে। মিথ থেকেই তারা শক্তি সঞ্চয় করেছে। আফ্রিকায়ও আমরা এ ধরনের অভিজ্ঞতা পাই। ল্যাটিন আমেরিকা লিবারেশন থিওলজির অভিজ্ঞতা মুক্তির লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কিউবা, নিকারাগুয়া, ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়ায় যে রূপান্তরগুলো হচ্ছে, সেই লড়াইয়ে এই ধারার চার্চের ভূমিকা দেখি, যাদের অবস্থান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে।

লিবারেশন থিওলজি বা মুক্তির ধর্মতত্ত্বের অনুসারীরা বলেন, ঈশ্বর হচ্ছেন জনগণের প্রভু; সে কারণে অবশ্যই শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের শত্রু। ঈশ্বর তাই কখনো পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করতে পারেন না। যদি কেউ ঈশ্বরকে পেতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এই ধারাটি অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ল্যাটিন আমেরিকায়। লিবারেশন থিওলজির আন্দোলন থেকে বোঝা যায়, ধর্মের ভাষা দিয়েও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, শোষণ-নিপীড়নবিরোধী লড়াই হতে পারে; ধর্মের ভাষা দিয়ে শ্রেণিসংগ্রামও হতে পারে। তবে তা এই সাথে এটাও দেখায় যে এ সবই নির্ভর করে ধর্মের নতুন মুক্তিকামী ব্যাখ্যা এবং সমাজে বিপ্লবী শক্তির সাবালক উপস্থিতির ওপর। বাংলাদেশে মওলানা ভাসানী ইসলামের একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যে ব্যাখ্যা ছিল শোষণের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সাম্যের পক্ষে। কিন্তু ভাসানী কোনো ধারা তৈরি করতে পারেননি। তার ফলে যেটা ল্যাটিন আমেরিকায় সম্ভব হয়েছে লিবারেল থিওলজির মধ্য দিয়ে, সেটা ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সম্ভব হয়নি। তার পেছনে বিপ্লবী শক্তির দুর্বলতা ও দৈন্যও নিশ্চয়ই দায়ী।

হেফাজত আন্দোলনে গরিব মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি দেখিয়ে কেউ কেউ বলতে চেষ্টা করেন, এটা গরিব নিপীড়িত মানুষের লড়াই। কোনো রাজনীতির ধারায় গরিব মেহনতি মানুষের উপস্থিতি দিয়ে যদি তাদের প্রতিনিধিত্ব বোঝায়, তাহলে দেশের মেহনতি মানুষের সবচাইতে বড় দুটো দল হলো আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। কারণ গরিব মানুষেরাই এই দুটো দলের প্রধান ভোটার, প্রধান সমর্থকগোষ্ঠী। বস্তুত কোনো রাজনীতি গরিব মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে কি না তা নির্ভর করে তার কর্মসূচির ওপর, তার শত্রু-মিত্র নির্ধারণের ওপর। এটা ঠিক যে অধিকাংশ মাদ্রাসায় গরিব মানুষের ছেলেমেয়েরাই পড়ে, কিন্তু এর বিকাশ, নিয়ন্ত্রণ গরিব মানুষের হাতে নয়। উপরন্তু মাদ্রাসা মানেই শুধু এরকম প্রতিষ্ঠান নয়, এখন স্কুলের পাশাপাশি খুবই ব্যয়বহুল ইংলিশ

মিডিয়াম মাদ্রাসাও গড়ে উঠছে অনেক বেশি সংখ্যায়। তার চাহিদা তৈরি হয়েছে ক্রমবিকাশমান মধ্যবিত্তের মধ্য থেকেই।

বস্তুত বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক এই রাজনীতির নেতৃত্ব বিত্তবান, সমাজে সুবিধাভোগীদেরই অংশ। তাদের অনেকের সন্তানরাই ব্যয়বহুল ইংলিশ মিডিয়ামে বা বিদেশে পড়ে, আর তাদের ক্ষমতার মজুদ হিসেবে কাজ করে মাদ্রাসার গরিব ছাত্র ও শিক্ষকরা। মাদ্রাসার গঠনগত নিয়ন্ত্রণমূলক বৈশিষ্ট্যের কারণে ধর্মীয় নেতা বা রাষ্ট্র পরিচালকরা তাদের ব্যবহারের সুযোগ পায়। মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, যারা অধিকাংশই গরিব বা নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান, তারা এই রাজনীতির প্রধান শক্তি হলেও নীতি নির্ধারণে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। 'ফতোয়াবাজ অশিক্ষিত মোল্লা' বলে ধর্মীয় পেশাজীবী গোষ্ঠীকে তিরস্কার করা সহজ; কিন্তু গরিব মানুষদের ওপর তাদের দাপট বুঝতে গেলে দেখতে হবে বিদ্যমান অ-মোল্লা ক্ষমতাবানদের সাথে তাদের যোগসূত্র। এই যোগসূত্রের কারণেই বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন স্তরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলনে এঁদের শামিল হতে দেখা যায় না। লুটেরা নির্যাতকদের বিরুদ্ধে তাঁদের কখনো ফতোয়া দিতে দেখা যায় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা ধর্মীয় বয়ান নিয়ে নির্যাতকদের রক্ষাকারী হিসেবে আবির্ভূত হন।

তাছাড়া ইহুদি-খ্রিস্টানবিরোধী রাজনীতি আর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনীতি এক কথা নয়। সাম্রাজ্যবাদ মানে শুধু বুশ বা ওবামা বা কিছু ইহুদি ব্যবসায়ী নয়, এটি একটি জৈবিক বিশ্বব্যবস্থা। এর চালকদের মধ্যে খ্রিস্টান-ইহুদি যেমন আছে, মুসলমান-হিন্দুও আছে। আবার ফিলিস্তিন থেকে শুরু করে ভেনিজুয়েলা পর্যন্ত যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিরোধ, সেখানে মুসলমানদের পাশাপাশি আমরা খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দুসহ বিভিন্ন ধর্ম ও মতের মানুষদের এক সারিতে দেখি। শুধু ধর্মপরিচয় দিয়ে তাই রাজনীতি শনাক্ত করা যায় না। কেননা এক ধর্মের মধ্যেই বহু সুর থাকে। বুশের গড ইরাকে হামলার নির্দেশ দেয়, শ্যাভেজের গড তাকে রুখে দাঁড়াতে বলে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা ইসলাম ও আল্লাহ-রসুলের দোহাই দিয়েই এদেশের লাখ লাখ মানুষকে খুন-ধর্ষণসহ ভয়ংকর অপরাধ করেছে। আবার অন্যদিকে অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা আল্লাহ-রসুলের নাম নিয়েই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আল্লাহ ও ধর্মের অর্থ তাই দুজনের কাছে ভিন্ন। একজনের কাছে নিপীড়নের অবলম্বন, আরেকজনের কাছে নিপীড়িতের আশ্রয়।

> এ পর্যায়ে একটি মহাবিপর্যয় থেকে জামায়াতকে কার্যত প্রথমে উদ্ধার করে ভারতের হিন্দুত্ববাদী বিজেপির কর্মসূচি, পরে আওয়ামী লীগের 'বৃহত্তর ঐক্য'।

তিন প্রকার সন্ত্রাসী এবং বাংলাদেশের পাঁচ বিপদ

কোণঠাসা হয়ে থাকলেও বাংলাদেশে ধর্মপন্থী দলগুলোর মধ্যে এখনো জামায়াতে ইসলামী সবচাইতে বড় ও সংগঠিত দল। এর বাইরেও, বিশেষত তথাকথিত 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' শুরু হবার পর থেকে নিত্যনতুন সংগঠনের নাম শোনা যায়। তবে এর কোনটা আসল কোনটা নকল বা কোনটা গোয়েন্দা সংস্থার তৈরি, তা বলা কঠিন। 'জঙ্গি' 'সন্ত্রাসী' দমনের নামে যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাস দমন' মডেলে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশও। একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে ভারতের সাথেও যৌথ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই মডেলে প্রবেশের অর্থ যে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীর বর্ধিত পুনরুৎপাদন এবং সন্ত্রাসের চিরস্থায়ীকরণ, তা আমরা অভিজ্ঞতা থেকেই দেখছি।

বর্তমানে 'জঙ্গি', 'ইসলামি সন্ত্রাসী' বলে যে প্রচারণা 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের' মূল ভিত্তি, তাতে তিন ধরনের ইসলামপন্থী গোষ্ঠীর বা 'সন্ত্রাসী'র দেখা পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমত, আসলেই কিছু কিছু ইসলামপন্থী গ্রুপ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে, যারা 'ইসলামি রাষ্ট্র', 'খিলাফত' প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাচ্ছে। এদের কেউ কেউ সন্ত্রাসী পথই সঠিক মনে করে, তবে সকলে 'সন্ত্রাসী' পথ অনুমোদন করছে তা নয়। পশ্চিমা ব্যবস্থার তারা বিরোধিতা করে, নিজেদের বুঝমতো ইসলামি হুকুমত কায়েম করতে চায়। তবে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, তার যে মানুষ ও পরিবেশবিধ্বংসী চরিত্র, তারা সেটার বিরোধিতা করে, না ধর্মীয় বিচারে নির্দিষ্টভাবে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের বিরোধিতা করে—সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ বিষয়ে সবার অভিন্ন বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। অধিকাংশের বিরোধিতা ধর্মীয় বিবেচনায়। সে কারণে সাম্রাজ্যবাদের মূল শক্তি তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকে।

দ্বিতীয়ত, আরেকটি ইসলামপন্থী ধারার নাম আমরা প্রচারণায় পাই, যারা বিভিন্ন দেশে গোয়েন্দা সংস্থার পালিত গোষ্ঠী বলে ধারণা করা যায়। বিভিন্ন সময়ে তাদের ব্যবহার করা হয়, যা অনেক সন্ত্রাসী ঘটনা নিয়ে সরকারের রহস্যজনক ভূমিকা থেকে পরিষ্কার হয়। এসব ঘটনার কোনো কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। কিন্তু সেগুলো দেখিয়েই দেশে দেশে নতুন নতুন নিপীড়ন ও নিয়ন্ত্রণমূলক চুক্তি-বিধি-নীতি তৈরি হতে থাকে।

তৃতীয়ত, মিডিয়ার মাধ্যমে নির্মিত। এসব প্রচারণার মাধ্যমে আতঙ্ক তৈরি এবং নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা, সামরিকীকরণ, নিরাপত্তা, বাণিজ্য—সবই বৈধতা পায়। আতঙ্ক এখন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বরাজনীতি এবং লুটেরা দেশীয় রাজনীতির অন্যতম অবলম্বন। খুবই পরিকল্পিত ও একচেটিয়া প্রচারণার কারণে ইউরোপ-আমেরিকার মানুষের মধ্যেও আতঙ্ক আর মুসলিমবিদ্বেষ দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, ভারতসহ মুসলিম সংখ্যালঘু দেশগুলোতে মুসলিম নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে। মুসলিম পোশাক, মুসলিম নাম, দাড়ি, হিজাব, বোরখা দেখলেই অনেকের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়, বর্ণবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই প্রবণতা মুসলমান জনগোষ্ঠীকেও ধর্মীয় পরিচয়কে গুরুত্ব দেবার দিকে ঠেলে দেয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সামনে এখন হাজির কমপক্ষে পাঁচ ধরনের বিপদ।

প্রথম বিপদ হলো সাম্রাজ্যবাদ। '৯০-পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের জন্য বড় আশ্রয়/যুক্তি/অছিলা হলো ইসলামি জঙ্গি/সন্ত্রাসী। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর তার সামনে দৃশ্যমান এবং উপস্থাপন করার মতো শত্রু নেই, যাকে দেখিয়ে নিজের সমস্ত অপকর্ম সে জায়েজ করতে পারে। তাদের যে সামরিক অবকাঠামো ও বিনিয়োগ তার যৌক্তিকতা কী, যদি বড় কোনো শত্রু না থাকে? যুক্তরাষ্ট্রের মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত রেখে, বিভিন্ন বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর স্বার্থে, সমরাস্ত্র, যুদ্ধ, আগ্রাসনের পেছনে বিপুল ব্যয় কিভাবে যুক্তিযুক্ত হবে? সুতরাং 'শত্রু' বাঁচিয়ে রাখা, কোথাও না থাকলে সেখানে তৈরি করা সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য আবশ্যিক। তার হাত ধরেই তাদের অগ্রযাত্রা। সুতরাং এই পরিস্থিতি সামনে আরো জটিল হবে। কারণ বাংলাদেশ-ভারতের মতো দেশগুলোর শাসক শ্রেণিও এই মডেলেই অগ্রসর হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিপদ হলো ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষ। বিশ্বজুড়ে ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষ ছড়িয়ে বিশ্বের মুসলমান সমাজকে যেভাবে ঘা দেওয়া

হচ্ছে, যেভাবে আহত করা হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে সম্প্রদায়গতভাবেই। এর ফলে ধর্মীয় রাজনীতির ভূমিই উর্বর হচ্ছে। ধর্মবিশ্বাসী বা নিয়মিত ধর্ম পালনকারী নন এমন ব্যক্তিরাও হয়ে উঠছেন ধর্মীয় রাজনীতির সমর্থক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেপরোয়া। সেজন্য আমরা পশ্চিমা দেশগুলোতে, ইংলিশ মিডিয়াম প্রতিষ্ঠান বা সমাজের সচ্ছল অংশগুলোতেও ইসলামপন্থী রাজনীতির প্রভাব বাড়তে দেখছি।

তৃতীয় বিপদ দেশের মূলধারার রাজনীতি। বৃহৎ রাজনৈতিক দুটি দল এবং তাদের জোট ক্ষমতা ও ভোটের রাজনীতিতে বিজয় অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা করে ধর্মপন্থী রাজনীতির ওপর ভর করেছে, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে। দেশের লুটেরা চোরাই কোটিপতিদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি এ দুই দল/জোট। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী, মাদ্রাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থী, পীরদের 'রিজার্ভ আর্মি' হিসেবে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করতে গিয়ে দুই প্রধান ধারার ভোটের রাজনীতি এখন এক কদর্য রূপ গ্রহণ করেছে। এরকম পরিস্থিতিতে দেশের জনস্বার্থবিরোধী বিভিন্ন চুক্তি ও তৎপরতা অনেক নিরাপদ হচ্ছে। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নামাবলী ব্যবহার করলেও এটা স্পষ্ট যে আওয়ামী লীগ বিএনপি-জামায়াতকে মোকাবিলার কৌশল হিসেবে হেফাজত ও তুলনীয় বিভিন্ন ইসলামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে সমঝোতা করছে। তার সহযোগী ওলামা লীগ হেফাজতি ভাষায়ই বক্তব্য দিচ্ছে। শাসক শ্রেণির এ দুই অংশের প্রতিযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা, তাদের আসা-যাওয়ার দুষ্টচক্র, অন্য বিকল্পের অভাবে, ধর্মপন্থী উগ্র অসহিষ্ণু রাজনীতি ও তাদের এজেন্ডাকেই শক্তিশালী করছে।

চতুর্থ বিপদ ভারতের রাষ্ট্র ও রাজনীতি। ভারতে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার প্রসার বাংলাদেশে ইসলামপন্থী রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিচ্ছে, সহায়তা করছে। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবাষ্প তৈরি হয়েছিল তার রেশ তো আছেই, তার সাথে ভারতের আগ্রাসী রাজনীতি ও অর্থনীতিও এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করছে।

পঞ্চম বিপদ বিপ্লবী, বামপন্থী বা জনপন্থী রাজনীতির দৈন্যদশা। সমাজ অর্থনীতির এই গতি ও বৈপরীত্য অর্থাৎ প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য, সমৃদ্ধি ও বঞ্চনা, সম্ভাবনা ও হতাশা, নিপীড়ন ও নিরাপত্তাহীনতা, চিকিৎসা বাণিজ্য ও চিকিৎসাহীনতা ইত্যাদির গোলকধাঁধার শিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। এর থেকে মুক্তির পথ খোঁজা মানুষের তাই অবিরাম তাগিদ। দেশে লুটেরা ও চোরাই কোটিপতিদের রাজনৈতিক আধিপত্যকে মোকাবিলা ও পরাজিত করার মতো রাজনৈতিক শক্তিই মানুষের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু তা বামপন্থীদের নেই। বরং তাদের বড় অংশ একের পর এক আপোস ও আত্মসমর্পণ করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করেছে। সমাজে তাই দিশাহীনতা, হতাশা ও অনিশ্চয়তা। পাঁচ নম্বরে উল্লেখ করলেও এটাই আসলে প্রধান সমস্যা। কেননা এই বিপদ দূর হলে আগের চারটি বিপদ মোকাবিলা করা বাংলাদেশের জনগণের জন্য খুবই সম্ভব। শ্রমিক, নারী, শিক্ষার্থী, জাতীয় সম্পদ নিয়ে বিভিন্ন ছোটবড় জনপ্রতিরোধে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপায় কী?

দেশে-বিদেশে এখন আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তা সব ধরনের সক্রিয়তার পথ আগলে আছে। জনগণের মুক্তির লড়াই ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের বর্তমান গতি ও জাল, তার অন্তর্গত সংকটের কারণেই, কার্যত এক বৈশ্বিক ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে গেছে বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষকে। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার ফ্যাসিবাদী আবহাওয়ার মধ্যে, কোথাও তার সহযোগী হিসেবে, কোথাও তার বিরোধিতা করতে গিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের ধর্মপন্থী রাজনীতির বিস্তার ঘটছে। কিন্তু ধর্মপন্থী রাজনীতি, তার কাঠামোগত ও মতাদর্শিক সীমাবদ্ধতার কারণেই, বর্তমান দানবীয় বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে সকল মানুষের একটি মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই এগিয়ে নিতে সক্ষম নয়; বরং বর্তমান ধরনে এই রাজনীতির বিস্তার দেশে দেশে মানুষের মুক্তির লড়াইকে বাধাগ্রস্ত করে বিশ্বের শোষক নিপীড়ক যুদ্ধবাজ জালেমদের শক্তিকেই স্থায়িত্ব দিচ্ছে। যাঁরা জালেমদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইচ্ছা নিয়ে এখানে শরিক হয়েছেন, জালেমের জাল সম্পর্কে তাঁদের মোহমুক্তি সবার জন্যই জরুরি।

এই শৃঙ্খল থেকে দুনিয়া ও মানুষের মুক্তির জন্য শ্রেণি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ জাতিগত বৈষম্য ও নিপীড়নবিরোধী বৈশ্বিক মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াই অপরিহার্য। দরকার ধর্ম বর্ণ জাতিগত গণ্ডি অতিক্রম করে মানবিক নতুন পরিচয়ে নিজেদের সংহতি দাঁড় করানো। তা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া এখনো নানা বাধার মুখে, তবে নতুনভাবে নির্মিত হবার লক্ষণও বিশ্বজুড়ে মাঝেমধ্যে দেখা দিচ্ছে। এই সংহতি ছাড়া কোনো ধর্মের মানুষেরই মুক্তি নেই, মুক্তি নেই ধর্মপন্থীদেরও। প্রতিকূলতা ও সংকটেই নতুন সৃষ্টির সময় আসে। প্রবল প্রতিকূলতা আর অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও সেখানেই আমাদের চিন্তা ও সক্রিয়তা যোগ করতে হবে।

আনু মুহাম্মদ: শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: anujuniv@gmail.com

তথ্যসূত্র

আহমেদ, ২০০৬। রেহনুমা আহমেদ (অনূদিত ও সংকলিত) : ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন, সমকালীন মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রাম, একুশে, ঢাকা।

আলম, ২০১৫। পারভেজ আলম : জিহাদ ও খেলাফতের সিলসিলা, আদর্শ, ঢাকা।

আলী, ২০০৩। Tariq Ali: Re-Colonizing Iraq. New Left Review, 15 February.

আলী, ২০০২। Tariq Ali: The Clash of Fundamentalism. Crusades, Jihads and Modernity, Verso, London.

আর্মস্ট্রং, ২০০১। Karen Armstrong: The Battle for God, A History of Fundamentalism, Random Publishing, NY.

জার্নাল, ১৯৯৭। The War on Freedom: How and Why America Was Attacked, PP.49-50; Wall Street Journal, 23 May. http://www.wsj.com.

টাইমস, ১৯৯৭। New York Times, 26 May. http://www.nytimes.com.

মুহাম্মদ, ১৯৯৪। আনু মুহাম্মদ : ধর্ম, রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন, চার্বাক, ঢাকা, ১৯৯৪।

মুহাম্মদ, ২০০০। আনু মুহাম্মদ : রাষ্ট্র ও রাজনীতি : বাংলাদেশের দুই দশক, সন্দেশ, ঢাকা।

মুহাম্মদ, ২০০৮। আনু মুহাম্মদ : কোথায় যাচ্ছে বাংলাদেশ? সংহতি, ঢাকা, ২০০৮।

মুহাম্মদ, ২০১০। আনু মুহাম্মদ : বিপ্লবের স্বপ্নভূমি কিউবা, শ্রাবণ, ঢাকা, ২০১০। ২য় সংস্করণ।

মুহাম্মদ, ২০১২। আনু মুহাম্মদ : নারী, পুরুষ ও সমাজ, সংহতি প্রকাশন, ৩য় সংস্করণ।